স্বমহিমায় শঙ্কু

সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব

Readon

প্রোফেসর শঙ্কুর প্রথম ডায়েরি সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৮-তে। আর ১৩৯৯-এর পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ দুটি অসমাপ্ত ডায়েরি 'ইনটেলেকট্রন' ও 'ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা'। কী হত এর পর—যদি তিনি গল্পদুটি সমাপ্ত করতে পারতেন? সত্যজিৎ রায়ের কল্পনা কোন খাতে গল্পদুটিকে টেনে নিয়ে যেত তা জানার আর কোনও উপায় নেই। তাঁর কল্পনাশক্তি বা লেখনশৈলীর ধারেকাছে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই সত্যজিৎ রায়ের অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনি শেষ করার চেষ্টা তাঁর জুতোয় পা গলানোর স্পর্ধা নয়, বরং সেই মহান স্রষ্টার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দুটি অসমাপ্ত কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ "কল্পবিশ্ব" ওয়েবজিনে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। যেন অনেকদিন পর স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন বাঙালির আরেক মহানায়ক। সেই গল্পদুটিকেই এবার সন্দীপ রায়ের অনুমোদনক্রমে দু-মলাটের মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া হল। এই বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও গ্রন্থসজ্জাতেও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যাতে সত্যজিৎ রায়ের মূল শঙ্কু-গ্রন্থগুলির স্বাদ ফিরে পাওয়া যায়।

-সুদীপ দেব

ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা (প্রোফেসর শঙ্কু)

(অসম্পূর্ণ গল্প)

১৬ই অক্টোবর

আজ আমার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হল। সকালে অবিনাশবাবু এসেছিলেন, আমার হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, মেনি হ্যাপি ডেজ অফ দ্য রিটার্ন। ভদ্রলোকের হাবভাব এতই আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল যে আমি আর ইংরেজিটা সংশোধন করলাম না।

দেশবিদেশ থেকে বহু বিজ্ঞানী বন্ধুরা আমায় অভিনন্দন জানিয়েছে। আমার সামনেই টেবিলে রাখা রয়েছে অন্তত খানপঞ্চাশেক চিঠি, টেলিগ্রাম আর গ্রিটিংস কার্ড। এখনও কাজ করতে পারছি—সেটাই বড় কথা। তার একটা কারণ অবশ্য মিরাকিউরল, আর আরেকটা আমার চাকর প্রহ্লাদের একনিষ্ঠ পরিচযা। সেও অবিশ্যি আমার মিরাকিউরলের সুফল ভোগ করেছে, যেমন করেছে আমার বেজ়ল নিউটন। গত পঞ্চাশ বছরে মিরাকিউরল থেকে শুরু করে কত কী যে আবিষ্কার করেছি, সেই কথাই ভাবছিলাম। অ্যানাইহিলিন পিস্তল, ঘুমের বড়ি সমনোলিন, লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেমব্রেন, ল্যাম্পের জোরালো আলো লুমিনিম্যাক্স, শ্যাঙ্কোপ্লাস্ট, শ্যাঙ্কোপ্লেন, কানে শোনা যায় না। এমন শব্দ শোনার জন্য মাইক্রোসোনোগ্রাফ-আরও কত কী!

এইসব ভাবছি এমন সময় প্রহ্লাদ এসে খবর দিল, একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন।

আমি আসতে বলতে যিনি প্রবেশ করলেন তার বয়স পাচিশের বেশি নয়। আমার সঙ্গে করমর্দন করে ছেলেটি বলল, আমার নাম চার্লস ড্রেক্সেল। আমার বাবার নাম হয়তো তুমি–

জন ড্রেক্সেল কি? বায়োকেমিস্ট?

হ্যাঁ। আমি বাবার ব্যাপারেই তোমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

তোমার বাবা এখন কোথায়?

প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। তিন দিন হল তাঁর মৃত্যু হয়।

সে কী! এ যে ভয়ংকর সংবাদ। ব্যাপারটা শুনি।

বলছি। পুরো ব্যাপারটাই বলছি, একটু ধৈর্য লাগবে।

ধৈর্যের কোনও অভাব নেই আমার।

বাবা শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না—তিনি পর্যটকও ছিলেন। দু বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি আরবি পুঁথির সন্ধান পান। বাবা আরবি জানতেন। অত্যন্ত দুপ্রাপ্য পুঁথি। সেটা পড়ে তিনি প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। বলেন, এই পুঁথিতে পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিস আবিষ্কারের পদ্ধতির বর্ণনা আছে।

সেটা কী জিনিস? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তাও বাবা বলেননি। বললেন, এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে লোকে এমনিই জানতে পারবে।

তারপর?

তারপর বাবা এক্সপেরিমেন্টের তোড়জোড় শুরু করেন। ব্যয়সাপেক্ষ এক্সপেরিমেন্ট—শহরে করা চলবে না-প্রাকৃতিক পরিবেশ চাই। বাবা ব্যাপারটাকে গোপন রাখার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ বেছে নেন। কোনও সংস্থা বাবাকে টাকা দিতে রাজি হয়নি। অবশেষে জোসেফ গ্রিমান্ডি নামে বাবার এক পরিচিত ধনী বায়োকেমিস্ট, বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এবং এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করতে রাজি হন। গ্রিমান্ডির শর্ত ছিল, পরীক্ষা সফল হলে তার জন্য অর্ধেক কৃতিত্ব সে দাবি করবে। বাবা তখন এমনই মেতে উঠেছেন যে, এই শর্তে তিনি রাজি হয়ে যান। তিন মাস আগে এই এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়। চিঠিতে জানতে পারতাম। বাবা দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। গ্রিমান্ডির চিঠি এল যে, মাত্র চার দিনের অসুখে কোনও অজ্ঞাত ট্রপিক্যাল ব্যারামে বাবার মৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞানীর দল যে যার দেশে ফিরে গেছে। অথচ বাবার শেষ চিঠিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, এক্সপেরিমেন্ট সফল হতে চলেছে।

তোমার বাবার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার নিজের কোনও ধারণা আছে?

আছে।

কী?

গ্রিমান্ডি এক্সপেরিমেন্টের পুরো ক্রেডিট নেবার জন্য বাবাকে খুন করেছে।

বুঝলাম। কিন্তু তুমি আমার কাছে এসেছি কেন?

আমি চাই, তুমি ওই দ্বীপে গিয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করো। এই ধরনের অভিযান তো তোমার কাছে নতুন কিছু নয়। তোমার দল নিয়ে তুমি চলে যাও। বাবার কাজটা অসম্পূর্ণ থাকলে বিজ্ঞানের পরম ক্ষতি হবে। দ্বীপের অবস্থান আমার জানা আছে, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।

—১৯৯১

==========

একই আকারের অপর একটি বাধানো খাতায় ১৯৯১-এর জুন মাসে লেখা ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা-র অসমাপ্ত খসড়াটি পাওয়া গেছে। বাবা গল্পটি পার পর মোট তিন বার লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ খসড়াটি এখানে প্রকাশ করা হল।

—সন্দীপ রায়

আনন্দমেলা । পূজাবার্ষিকী ১৩৯৯ৎ

ইনটেলেকট্রন (প্রোফেসর শঙ্কু)

(অসমাপ্ত গল্প)

এপ্রিল ৩

অনেকদিন পরে একটা নতুন জিনিস তৈরি করলাম। একটা যন্ত্র, যাতে মানুষের বুদ্ধি মাপা যায়। বুদ্ধি বলতে অবশ্য অনেক কিছুই বোঝায়। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সাধারণ বুদ্ধি বা কমনসেনসী, ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদি সবই এরমধ্যে পড়ে। আমার অন্যান্য যন্ত্রের মতো এটাও খুবই সরল। যার বুদ্ধির পরিমাপ হবে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে মাথার দুপাশে হেডফোনের মতো দুটো ইলেকট্রেড লাগিয়ে দিতে হয়। সেই ইলেকট্রোডের তার একটা বাক্স জাতীয় জিনিসের গায়ে লাগানো হয়। সেই বাক্সের সামনেট কাচে ঢাকা, সেই কাচের পিছনে দাগ কাটা আছে একশো থেকে এক হাজার পর্যন্ত। যন্ত্রটা মস্তিষ্কের সঙ্গে লাগিয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেই একটা কাঁটা একটা বিশেষ নম্বরে গিয়ে দাঁড়য়। সেই নম্বরটাই হল বুদ্ধির পরিমাপ। রীতিমতো বুদ্ধিমান লোকেদের সাতশো থেকে হাজারের মধ্যে নম্বর ওঠা উচিত, পাঁচশো থেকে সাতশো হল চলনসই বুদ্ধি, আর পাঁচশোর নীচে হলে আর সে লোককে বুদ্ধিমান বলা চলে না। আমি যন্ত্রটা স্বভাবতই প্রথমে নিজের উপর পরীক্ষা করে দেখি। নম্বর উঠল ৯১৭। তারপর বিকেলের দিকে অবিনাশবাবু এলেন। তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে ইলেকট্রোড লাগিয়ে বোতাম টিপতে নম্বর উঠল ৩৭৭। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ওতে কী হিসেব পেলেন? বললাম, আপনার বুদ্ধির হিসেব।

কেমন বুঝলেন?

মোটামুটি যেমন ভেবেছিলাম তেমনই।

তার মানে বোকা?

না না, বোকা হতে যাবেন কেন? আপনার বইপড়া পাণ্ডিত্য যে নেই, সেটা নিশ্চয়ই আপনিও স্বীকার করবেন। তবে আপনার সাধারণ বুদ্ধি মোটামুটি আছে। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, সেটা হল আপনি সৎ লোক। সেটা কম গুণ নয়।

এই সৎ লোকের হিসেবগুলি ওই যন্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে?

না। ওটা আমার সঙ্গে আপনার বিশ বছর পরিচয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি ইনটেলেকট্রন। জুন মাসে হামবুর্গে আবিষ্কারক সম্মেলন বা ইনভেনটরস কনফারেন্স আছে, তাতে যন্ত্রটা নিয়ে যাব। তবে মুশকিল হবে এই যে অনেকেই নিজের বুদ্ধির পরিমাপ জানতে দ্বিধা করবে। একেবারে অঙ্কের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া কার কতটা বুদ্ধি আছে, এটা সকলে খুব ভাল চোখে দেখবে না। আর আমার যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করে কি না সেই নিয়েও অনেকে নিশ্চয়ই সন্দেহ প্রকাশ করবে। কিন্তু আমি জানি, এ যন্ত্রে কোনও ভুল নেই। আমার সব আবিষ্কারই এ পর্যন্ত ঠিকমতো কাজ করে এসেছে; এটাও না করার কোনও কারণ নেই।

বিকেলে হঠাৎ নকুড়বাবু-নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—এসে হাজির। ভদ্রলোকের সঙ্গ আমার বেশ ভালই লাগে। আর মাঝে মাঝে সব অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন বসবার ঘরের সোফাতে বসেই বললেন, আপনি তো জুন মাসে আবার বাইরে চললেন।

তা যাচ্ছি বটে, আপনার গণনায় ভুল নেই।

এবার কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

কেন বলুন তো?

না হলে আপনার বিপদ আছে।

ভদ্রলোকের কথায় কখনও ভুল হতে দেখিনি, তাই চিন্তায় পড়ে গেলাম। অবিশ্যি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি নেই, অসুবিধাও নেই-কারণ কনফারেন্সের তরফ থেকে সেক্রেটারির একটি করে টিকিট পাঠায়। সেটা আমার আর ব্যবহার করা হয় না-কিন্তু এবার নাহয় করব।

আপনার বুদ্ধিনির্ধারণ যন্ত্রটা একবার দেখতে পারি কি?

এই প্রশ্নও ভদ্রলোকের ক্ষমতার একটা পরিচয়, কারণ ওঁকে আমি যন্ত্রটা সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। বললাম, নিশ্চয়ই—তবে সেটা আমি না। এনে আপনি সেটার কাছে গেলে আরও সুবিধে হয়।

নকুড়বাবু অবশ্যই রাজি। তাঁকে নিয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে গেলাম। যন্ত্রটা নানা দিক থেকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, আমি একবার চেয়ারে বসব নাকি?

বসুন না—তবে আপনার অলৌকিক বুদ্ধির পরিমাপ এতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

নকুড়বাবু বসলেন। কাঁটা উঠে ৫৫৭-তে থেমে গেল। বললাম, আপনি মোটামুটি বুদ্ধিমানদের দলেই পড়েন।

ভদ্রলোক একপেয়ালা কফি খেয়ে উঠে পড়লেন।

আমার ঠিকানা তো আপনার জানাই আছে। হামবুর্গ যাবার আগে খবরটা দেবেন। আমি সঙ্গে গেলে আপনার মঙ্গল হবে।

—১৯৮৯

==========

উপরে মুদ্রিত অসমাপ্ত গল্পের নামকরণ বাবা করেছিলেন—ইনটেলেকট্রন। একটি বাঁধানো রুলটানা কাগজের খাতায় (১১ ইঞ্চি x ৮.৫ ইঞ্চি) খসড়াটি পাওয়া গেছে। এটি সম্ভবত ১৯৮৯-এর জুন মাসে লেখা। ওই একই মাসে তিনি শেষ করেছিলেন ডাক্তার নন্দীর (মুন্সীর) ডায়রি ও

গোলাপি মুক্ত রহস্য। ইনটেলেকট্রন পরে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

—সন্দীপ রায়

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী, ১৩৯৯